



4033 - আশুরা দবিস উদযাপন কথিবা আশুরার মাতম করার বধিান ক?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আশুরা উপলক্ষে মানুষ চোখে সুরমা দিয়ে, গোসল করে, মহেদে লাগায়, মুসাফাহা করে, দানাদার খাদ্য রান্না করে, খুশি প্রকাশ করে ইত্যাদি করার বধিান ক? এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ককি কোন সহহি হাদিস বর্ণতি হয়ছে; নাকি হয়নি? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এগুলো কবিদিআত নয়? আবার অপর গোষ্ঠী যা করে থাকে- মাতম, দুঃখ প্রকাশ, তৃষ্ণার্ত থাকা, চৎকার-কান্নাকাটি করা, বুকুরে কাপড় খুলে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করা- এগুলোর ককি কোন ভিত্তি আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখুল ইসলামকে এই প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন: সমস্ত প্রশংসা বশিঁব জাহানরে প্রতাপিলক আল্লাহর জন্য। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কথিবা তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে কোন সহহি হাদিস বর্ণতি হয়নি। মুসলিম ইমামদরে কড়ে, কথিবা চার ইমামরে কড়ে কথিবা অন্য কোন আলমে এসব কাজকে মুস্তাহাব বলেননি। বর্ণনা নরিভর গ্রন্থগুলোতে এ ব্যাপারে কিছু নহে; না আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে; না তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে, না তাবয়ীগণ থেকে; না আছে সহহি কোন রেওয়ায়েত; না আছে দুর্বল কোন বর্ণনা। না আছে সহহি কোন হাদিস গ্রন্থে; না আছে সুনান শরীকের গ্রন্থগুলোতে; না আছে মুসনাদ শরীকের গ্রন্থগুলোতে; উত্তম প্রজন্মগুলো থেকে এ সংক্রান্ত কোন হাদিস জানা যায় না। তবে, পরবর্তীতে কিছু ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছু হাদিস বর্ণনা করছেন। যমেন- যে ব্যক্তি আশুরার দিন সুরমা লাগাবে সে ব্যক্তি ঐ বছর চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত হবে না। যে ব্যক্তি আশুরার দিন গোসল করবে সে ব্যক্তি ঐ বছর আর অসুস্থ হবে না। এ ধরনের আরও অনেকে হাদিস। আশুরার দিন নামায পড়ার অনেকে ফজলিতও তারা বর্ণনা করছেন। তারা বর্ণনা করছেন যে, এই দিন আদম (আঃ) তওবা করছেন; এই দিন নূহ (আঃ) এর কিস্তি জুদি পর্বতে নঙ্গর করছে; এদিন ইউসুফ (আঃ) ইয়াকুব (আঃ) এর কাছে ফরিে এসছেন; এই দিন ইব্রাহিম (আঃ) কে আগুন থেকে মুক্ত করা হয়ছে; এই দিন ইসমাইল (আঃ) এর বদলে বকরী জবাই করা হয়ছে ইত্যাদি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে একটি বানোয়াট হাদিস তারা বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি এ আশুরার দিন তাঁর (নবীর) পরিবারের কারো সচ্ছলতা এনে দবে আল্লাহ সারা বছর তাকে সচ্ছল রাখবেন।

এরপর শাইখুল ইসলাম ইরাকের কুফাতে বসবাসরত দুইটি পথভ্রষ্ট দল সম্পর্কে আলোচনা করেন; যারা আশুরার দবিসকে তাদের বদিআত বাস্তবায়ন করার জন্য উৎসব হিসেবে গ্রহণ করত। এ দুই দলের একদল হচ্ছে-রাফজি; যারা আহলে বাইতের প্রতিমহব্বত দেখায়; আর ভতিরে ভতিরে তারা হয়তো ধর্মত্যাগী মুরতাদ, নয়তো কুপ্রবৃত্তির অনুসারী জাহলে। আর অপর দল হচ্ছে-নাসবে; যারা ফতিনার সময় যে যুদ্ধ হয়েছে সে কারণে আলী (রাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি বিদ্বেষে পোষণ করে। সহহি হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাক্ষ্যস্বত্ব হয়েছে যে, তিনি বলেন: “সাকফি গোত্রের একজন মথিযাবাদী ও একজন ধ্বংসকারী জন্মাবে।” মথিযাবাদী লোকটি হচ্ছে- মুখতার বনি আবু উবাইদ আল-সাকফি। সে আহলে বাইতের প্রতিমহব্বত প্রকাশ করত এবং নজিকে তাদের পক্ষের লোক হিসেবে প্রচার করত। সে ইরাকের গভর্নর উবাইদুল্লাহ বনি যয়াদকে হত্যা করে। যে উবাইদুল্লাহ হুসাইন বনি আলী (রাঃ) কে হত্যাকারী সন্যাসদল প্রেরণ করছিল। পরবর্তীতে এ মুখতার তার মথিযা মুখশে উন্মোচন করে এবং নবুয়ত দাবী করে; বলে যে তার উপর জব্রাইল ফরেশেতা নাযিল হয়। এক পর্যায়ে যখন ইবনে উমর (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে তার ব্যাপারে জানানো হল। তাদের কোন একজনকে যখন বলা হল: মুখতার বনি আবু উবাইদ দাবী করছে যে, তার উপর জব্রাইল নাযিল হয়। তখন তিনি বললেন: সে সত্যই বলছে; আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমি কিতামোদেরকে জানাব কাদের উপর শয়তানরো নাযিল হয়? তারা নাযিল হয় প্রত্যেকে মথিযাবাদী, পাপীর উপর। অন্যজনকে যখন বলা হল: মুখতার দাবী করছে যে, তার উপর ওহি নাযিল হয়। তিনি বললেন: সে সত্যই বলছে - “নিশ্চয় শয়তানরো তাদের বন্ধুদের প্রতি ওহি (প্রত্যাদেশে) নাযিল করে যাতো তারা তমোদের সাথে তর্ক করতে পারে।” [সূরা আনআম, আয়াত: ১২১] আর ধ্বংসকারী হচ্ছে- হাজ্জাজ বনি ইউসুফ আস-সাকফি। সে ছিল আলী (রাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের বিরোধী। তাই সে ছিল নাসবেতিখা আহলে বাইতের বিদ্বেষী। আর প্রথমজন ছিল রাফজি। এ রাফজি লোকটি ছিল সবচেয়ে বড় মথিযাবাদী ও ধর্মত্যাগী। কারণ সে নবুয়ত দাবী করছিল।

কুফাতে এ দুই দলের মধ্যে কোনদল ও যুদ্ধ লগে থাকত। হুসাইন বনি আলী (রাঃ) কে আশুরার দিন হত্যা করা হয়েছে। তাঁকে হত্যা করেছে- জালমি ও বদিরোহী দল। আল্লাহ তাআলা হুসাইন (রাঃ) শাহাদাতের মর্যাদা দান করছেন। যমেনভাবে তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যগণকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছিলেন। শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছেন হামযা (রাঃ), জাফর (রাঃ), তাঁর পতি আলী (রাঃ) প্রমুখ। এ শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করছেন, সম্মান বৃদ্ধি করছেন। তিনি ও তাঁর ভাই হাসান (রাঃ) জান্নাতী যুবকদের নতো। উচ্চ মর্যাদা পরীক্ষা ছাড়া অর্জন করা যায় না। যমেনটি বলছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: যখন তাঁকে জিজ্ঞাসে করা হল, কন্ মানুষ সবচেয়ে কঠনি পরীক্ষার শিকার হয়? তিনি বললেন: নবীগণ। এরপর নকেকার ব্যক্তিগণ। এরপর এদের চয়ে দ্বীনদারতি যারা নমিন পর্যায়ে তারা। এরপর তাদের চয়ে দ্বীনদারতি নমিন পর্যায়ে যারা তারা। ব্যক্তির দ্বীনদারি অনুপাতে তাকে পরীক্ষা করা হয়। ব্যক্তির দ্বীনদারি অনকে মজবুত হলে পরীক্ষার তীব্রতা বাড়ানো হয়। দ্বীনদারি হালকা হলে পরীক্ষা সহজ করা হয়। মুম্নিকে পরীক্ষায় ফলেতে ফলেতে এক পর্যায়ে মুম্নি ভূপৃষ্ঠে হটে বড়োয় অথচ তার কোন গুনাহ থাকে না। [তিরমযি ও অন্য গ্রন্থকারগণ হাদিসটি সংকলন করছেন] হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বই উচ্চ মর্যাদা নির্ধারতি ছিল। তাঁদের উত্তম পূর্বসূরী যে কঠনি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাঁরা তত কঠনি পরীক্ষার সম্মুখীন হননি। তাঁরা

দু'জনরে জন্ম হয়েছিল ইসলামের জয় জয়কার সময়ে। সম্মান ও মর্যাদার মধ্যে তাঁরা বড় হয়েছেন। মুসলমানরা তাঁদের দুজনকে শ্রদ্ধা সম্মান করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারা যান তখনও তাঁদের পূরণ বুঝ হয়নি। তাই তাদের উপর আল্লাহ তাআলার নয়ামত হচ্ছে। তিনি তাদেরকেও পরীক্ষায় ফেললেন; যাতে তারা তাদের পূর্বসূরদের কাতারে এসে যেতে পারে। যত্নে তাদের চয়ে যিনি উত্তম তাঁকেও পরীক্ষা করা হয়েছে। আলী (রাঃ) তাদের চয়ে উত্তম। তাঁকে হত্যা করে শহীদ করা হয়েছে। হুসাইন (রাঃ) এর হত্যাকাণ্ডের ফলে মানুষের মধ্যে বড় ফতিনা ও গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়েছে। এর পূর্বে ওসমান (রাঃ) এর হত্যাকাণ্ড উম্মতের ভিত্তিকে আবশ্যকীয় করে তোলেন। যার ফলমোন্স য়ে ভিত্তি হয়েছে সে ভিত্তি আজো রয়েছে। তাই তো হাদিসে এসেছে- “যে ব্যক্তি তিনি জনিসি থেকে মুক্তি পেয়েছে সে আসলেই মুক্তি পেয়েছে: আমার মৃত্যু, একজন ধর্মশীল খলফার হত্যাকাণ্ড এবং দাজ্জাল।”

এরপর শাইখুল ইসলাম হুসাইন (রাঃ) এর জীবনের কিছু অংশ ও তাঁর ন্যায়পরায়ণতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন: “তিনি মারা গিয়ে আল্লাহর রহমত ও তাঁর সন্তুষ্টিতে স্থান করে নিয়েছেন। অথচ এমন কিছু দল রয়েছে যারা হুসাইন (রাঃ) এর সাথে পত্র আদান প্রদান করে প্রয়োজনের সময় তাঁকে সমর্থন দায়ের ও সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তারা সে প্রতিশ্রুতিরক্ষা করেনি। তিনি যখন তাদের কাছে তাঁর ভাজিককে পাঠালেন তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রাখেনি। শুধু তাই নয় তারা তাঁর পক্ষ নিয়ে লড়াই করার পরবর্ত্তে তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) এর মত হুসাইন (রাঃ) এর বিচক্ষণ শূভাকাংখীগণ তাঁকে সসেব প্রতিশ্রুতি গ্রহণ না করতে ও তাদের কাছে না যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাদের দৃষ্টিভিঙি ছিল তাদের নিকট যাওয়াতে কোন কল্যাণ নেই, এর পরিণতি শূভ হবে না। তারা যা বলেছেন সেটাই ঘটেছে। তাকদীর তো আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারণিত। যখন হুসাইন (রাঃ) তাদের কাছে পৌঁছে দেখলেন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন; তখন তিনি ফেরত চলে যাওয়ার কথিবা কোন সীমান্ত চকতিে আশ্রয় নায়ের কথিবা তাঁর চাচাত ভাই ইয়াজদি এর সাথে দেখা করার সুযোগ চাইলেন। কিন্তু তারা বন্দী হিসেবে আত্মসমর্পণ না করলে তাকে কোন সুযোগ দিতে রাজি হিল না। এক পর্যায়ে তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনিও তাদের বিরুদ্ধে লড়ে গেলেন। অবশেষে তারা তাঁকে ও তাঁর পক্ষরে লোকজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে শহীদ করল। আল্লাহ তাআলা এই শাহাদাতের মাধ্যমে তাঁকে আহলে বাইতের পুতপবিত্র পূর্বসূরদের সাথে একত্রিত করলেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর সাথে যারা অন্যায় করেছে ও সীমালঙ্ঘন করেছে তাদেরকে অপমানিত অপদস্থ করলেন। এই ঘটনা মানুষের মধ্যে অকল্যাণকে অনবির্য করে তুলছে। একদল মানুষ- জাহলে ও জালমে পরিণিত হয়েছে। অপর একদল হয়েছে- নাস্তিকি মুনাফকি। অপর একদল হয়েছে- পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত। পথভ্রষ্ট দলটি তাঁর প্রতি ও আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত। তারা আশুরার দনিকে মাতম, দুঃখপ্রকাশ ও ক্রন্দনের দনি হিসেবে গ্রহণ করত। এই দনিে তারা জাহলে রীতিতে গালে চড় মারা, বুকরে আচ্ছাদন উন্মুক্ত করা ও জাহলে রীতিতে শোক প্রকাশ করা ইত্যাদি চর্যা করে। অথচ সদ্য ঘটতি বপিদ মুসবিতের ক্ষতেরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নরিদশে হচ্ছে- ধর্ম ধারণ করা, বপিদকে সওয়াব অর্জনের মওকা হিসেবে গ্রহণ করা ও ইন্না লিল্লাহ... বলা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَشَرَّ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156)
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

(অর্থ- তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যারা বপিদে পতিত হলে বলবে: ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন (নশিচয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই সান্নিধ্যই আমরা ফরিবে যাবো)। এদের প্রতি আল্লাহর কৃপা ও রহমত নাযিল হয় এবং এরা সুপথপেরচিলতি।) [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫] সহিহ হাদিসে এসেছে- “যে ব্যক্তি গালে চপটোঘাত করে, বুকুরে আচ্ছাদন খুলে ফলে (অসন্তুষ্ট প্রকাশার্থে) ও জাহলী ডাক চড়িকার করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়”। তিনি আরও বলেন: “(বপিদরে সময়) ডাক চড়িকার করে করন্দনকারী, মাথা মুণ্ডনকারী ও পোশাক আশাক ছিন্নবিন্ধকারীর সাথে আমার সম্পর্ক নাই”। তিনি আরও বলেন: “যদি বলিপকারী মৃত্যুর আগে তওবা না করে তাহলে কয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে তার গায়ে থাকবে আলকাতরার পোশাক, শরীরের চামড়া যেন গুটি বসন্তেরে বর্ম।” মুসনাদে এসেছে-ফাতমো বনিত হুসাইন তাঁর পতি হুসাইন (রাঃ) থেকে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, “যদি কোন ব্যক্তি তার পুরাতন কোন মুসবিতের কথা স্মরণ করে এবং নতুনভাবে আবার ইন্না লিল্লাহ... পড়ে তাহলে মুসবিতের দিন আল্লাহ তাকে যে সওয়াব দিয়েছিলেন আজকেও সে সওয়াব দবিনে।” এটি মুমনিদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তাই হুসাইন (রাঃ) এর মুসবিত এবং অন্য কারো মুসবিতের কথা স্মরণ হলে মুমনিদের কর্তব্য হচ্ছে- ইন্না লিল্লাহ... পড়া; যতাব্দে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পড়ার নরিদশে দিয়েছেন; যাতে করে বপিদরে দিন বপিদাপন্ন ব্যক্তিকে আল্লাহ যতাব্দে সওয়াব দিয়েছেন তাকেও সে সওয়াব দনে। তাই আল্লাহ তাআলা যদি খোদ বপিদরে সময় ধৈর্য রাখার ও সওয়াবপ্রাপ্তির নিয়ত করার নরিদশে দনে তাহলে এতকাল পরে ব্যাপারটা কমন হতে পারে! এজন্য পথভ্রষ্ট ও ভিন্নান্ত গোষ্ঠী কর্তৃক আশুরার দিনে মাতম করা, বলিপ ও ডাক চড়িকার করা, শোকাবহ কাসদি (কবিতা) পড়া, বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা যগুলো মথিযাতে ভরপুর; আর কিছু সত্য হলেও এতে শোককে চাঙা করা ও গাউঁমি বাড়ানো ছাড়া কোন ফায়দা নাই- এসব কিছু শয়তানের প্ররোচনা। এতে করে পারস্পারিক জঘাংসা বাড়বে, যুদ্ধের উস্কানি দিয়া হয়, ইসলামপন্থীদের মাঝে গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়, পূর্ববর্তীদেরকে গালগিলাজ করার পথ খুলে যায়, দুনিয়াতে মথিয়ার ঢাকঢোল ও বশিঙখলা সৃষ্টি হয়। এই পথভ্রষ্ট ভিন্নান্ত দলটির মত আর কোন মুসলিম উপদল মুসলমানদের বিরুদ্ধে মথিযাচার, পারস্পারিক গোলযোগ সৃষ্টি ও কাফরেদের সাথে সহযোগিতা করে না। এরা খারজেদের চয়ে জঘন্য; যাদের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তারা মূর্তপূজকদেরকে বাদ দিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করে।” আর এরা আহলে বাইত (নবী পরিবার) ও উম্মতে মুসলিমার বিরুদ্ধে ইহুদি, নাসারা ও মুশরকদেরকে সাহায্য দিয়েছে। তারা বাগদাদে ও অন্যান্য স্থানে আহলে বাইত তথা আব্বাস (রাঃ) এর বংশধরদের বিরুদ্ধে তুর্কি মূর্তপূজক ও তাতারি মূর্তপূজকদেরকে সাহায্য দিয়েছে; যারা হত্যাযজ্ঞ, বন্দি ও ঘরবাড়ী ধ্বংস ইত্যাদির কোন কিছু বাদ রাখেনি। মুসলমানদের উপর এ দলটির ক্ষতি কোন বাগ্মীর পক্ষেও ববিত করা সম্ভব নয়। এ দলটির বপিরীতে রয়েছে- আরকে গোষ্ঠী; যারা হয়তবা হুসাইন (রাঃ) ও তাঁর পরিবারের প্রতি বিদ্বেষী নাসাবি গোষ্ঠী; অথবা তারা মূর্খ জাহলে মানুষ। এরা অন্যায়ের মোকাবিলায় আরকে অন্যায় করে; মথিয়ার মোকাবিলায় মথিযা বলে, মন্দরে মোকাবিলার করে মন্দ দিয়ে, বদিআতের মোকাবিলার করে বদিআত দিয়ে। আশুরার দিন চোখে সুরমা, চুল-দাঁড়িতে মেহেদে লাগানো, পরিবারের সদস্যদের জন্য

অতিরিক্ত খরচ করা, ভাল খাবারদাবার রান্না করা ইত্যাদি ঈদরে সময় যা যা করা হয় সেগুলোর মাধ্যমে আনন্দ স্ফূর্তি প্রকাশ করার সপক্ষে তারা কিছু রোয়েয়াতে বানিয়েছে। এভাবে এ গোষ্ঠী আশুরাকে ঈদ-উৎসবে পরণিত করেছে। আর অপর গোষ্ঠী আশুরাকে মাতম ও শোকাবহ দবিসে পরণিত করেছে। এ দুটি দলই বিভিন্ন তত্ত্ব লিপিত; এরা সবাই সুনতনে বরখলোপকারী। যদও রাফজেরি উদ্দেশ্য-লক্ষ্য অতীতঘন্য, তাদরে অজ্ঞতা চরম পর্যায়ে, তাদরে অন্যায় প্রকাশ্য। কনিতু আল্লাহ তাআলা সবার সাথে ন্যায় বিচার করার নরীদশে দয়িছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “আমার পরবর্তীতে তোমরা যারা বঁচে থাকবে অচরিতই তারা চরম মতানৈক্য দেখবে। সে মুহুর্তে তোমাদের উচিত হবে- আমার আদর্শ ও আমার পরবর্তী খোলাফায় রাশদো (সুপথে পরিচালিত) এর আদর্শ অনুসরণ করা। তোমরা এ আদর্শকে আঁকড়ে ধরবে, বরং দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। আর নবপ্রচলিত বিষয়গুলো থেকে বরিত থাকবে। কারণ প্রত্যকে অভিনব বিষয় বদীআত এবং প্রত্যকে বদীআতই বিভিন্নতা।” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথিবা তাঁর পরবর্তীতে খোলাফায় রাশদোর কটে আশুরার দনি এসব কিছু, শোকাবহ আচার অনুষ্ঠান কথিবা আনন্দব্যঞ্জক অনুষ্ঠান কোনটি চালু করেনি। তবে “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদনি এলেন তখন দেখলেন ইহুদরি আশুরার দনি রোজা রাখা তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেসে করলেন, এর হতে কী? তারা বলল: এদনি আল্লাহ মুসা (আঃ) কে সমুদ্রে ডুবো যাওয়া থেকে রক্ষা করছেন; তাই আমরা রোজা রাখি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: মুসা (আঃ) এর প্রতি আমাদের অধিকার তোমাদের চয়ে বেশি। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনি রোজা রাখলেন এবং রোজা রাখার নরীদশে দলিনে।” জাহলে যুগে কুরাইশরাও এই দনিকে সম্মান করত।

আশুরার রোজা রাখার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর য়ে নরীদশে এসছে সেটো শুধু ঐ বছরে সে দনিট রোজা রাখার ক্ষত্রে প্রযোজ্য হয়। কারণ তিনি মদনিয় এসছেলিনে রবউল আউয়াল মাসে। পরবর্তী বছর তিনি নিজি আশুরার রোজা রাখলেন ও সাহাবীগণকে রোজা রাখার নরীদশে দলিনে। এরপর রমজানের রোজা ফরজ করা হয় এবং রমজানের রোজার বধিান আশুরার রোজার বধিানকে রহিত করে দেয়। সে নরীদশেরে ভিত্তিতে সে দনিরে রোজা রাখা কী ফরজ ছিল নাকি মুস্তাহাব ছিল- এ বিষয়ে আলমেগণ দ্বিমিত করেন। তবে সর্বাধিক শুদ্ধ অভিমিত হচ্ছ- সেনিরে রোজা রাখা ফরজ ছিল। পরবর্তীতে যারা এই দনি রোজা রাখতেন তারা মুস্তাহাব হিসেবে রাখতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার দনি সর্ব সাধারণকে রোজা রাখার নরীদশে দতিনে না; বরং বলতেন, “আজ আশুরার দনি। আমি রোজা রেখেছি। তোমরা যারা রোজা রাখতে চাও রোজা রাখতে পার।” তিনি আরও বলতেন: “আশুরার দনিরে রোজা বগিত এক বছরে গুনাহ মাফ করিয়ে দেয়। আর আরাকার দবিসরে রোজা বগিত ও আগত দুই বছরে গুনাহ মাফ করিয়ে দেয়।”

“তাঁর শেষে জীবনে যখন তাঁকে জানানো হল য়ে, ইহুদরি এই দনিকে উৎসব দবিস হিসেবে গ্রহণ করে তখন তিনি অব্যবহিত প্রকাশ করে বললেন: যদি আমি আগামী বছর বাঁচি তাহলে ৯ তারখিও রোজা রাখব” য়াতে ইহুদরি বরখলোপ করতে পারেন এবং তাদরে ঈদ-উৎসব পালনের সাথে সাদৃশ্য হয়ে না যায়। সাহাবায়েরোম ও আলমেদেরে মধ্যে কটে কটে এই দনি রোজা রাখতেন না এবং রোজা রাখাকে মুস্তাহাব বলতেন না। বরং এককভাবে এই দনি রোজা রাখাকে মাকরুহ বলেন। এমন মতামত

কুফার একদল আলমে থেকে বর্ণিত আছে। আলমেদের মধ্যে কটে কটে এই দিন রোজা রাখাকে মুস্তাহাব বলেন। সঠিক মত হচ্ছে- যবে ব্যক্তি আশুরার দিন রোজা রেখেছে তার জন্য ৯ তারিখেও রোজা রাখা মুস্তাহাব। কারণ এটাই হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ নির্দেশ। কারণ হাদিসের কোন কোন সূত্রে তাঁর কথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে “যদি আমি আগামী বছর বাঁচি তাহলে ১০ তারিখে সাথে ৯ তারিখেও রোজা রাখব”। অতএব, জানা গলে শুধু রোজা রাখার আমলটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জারী করছেন। এ ছাড়া অন্য যা কিছু আছে যমেন- দানাদার কথিবা দানাহীন বিশেষ খাবার তরী, নতুন পোশাক পরিধান করা, অতিরিক্ত খরচ করা, সারা বছরে বাজার সন্ধানি করে রাখা, বিশেষ কোন ইবাদত পালন করা; (যমেন বিশেষ নামায, পশু জবাই, সেই দিন রান্না করার জন্য কেরবানীর গাশত সংরক্ষণ করে রাখা), সুরমা লাগানো, মহেদে লাগানো, গোসল করা, মুসাফাহা করা, পারস্পরিক দেখা সাক্ষাত করা, বিশেষ কোন মসজিদ বা মসজিদসমূহ য়ারত করতে যাওয়া ইত্যাদি সব গরহতি বদিআত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথিবা তাঁর খলিফাবর্গের কটে এর কোনটি জারী করেননি; এমনকি মুসলিম আলমেগণের কটে এ কাজগুলোকে মুস্তাহাব বলেননি। যমেন- ইমাম মালকে, ইমাম ছাওরি, ইমাম লাইছ বনি সাদ, আবু হানফি, আওয়াযি, শাফয়ে, আহমাদ বনি হাম্বল, ইসহাক বনি রাহুইয়া প্রমুখের মত কোন ইমাম বা আলমে এ কাজগুলোকে মুস্তাহাব বলেননি।

দ্বীন ইসলাম মূলতঃ দুইটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক: আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না। দুই: আমরা আল্লাহর বধিান মোতাবেক তাঁর ইবাদত করব; বদিআত মোতাবেক নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতএব, যবে ব্যক্তি তাঁর রবের (প্রতিপালকের) সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন আমলে সালহে করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ১১০]

আমলে সালহে হচ্ছে- যবে আমল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসনে, পছন্দ করেন; সটোই শরয়িত ও সুন্নাহ। তাইতো উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) তাঁর দুআতে বলতেন: “হে আল্লাহ, আমার সকল আমল যনে সালহে (সুন্নাহ মোতাবেক) হয়, আপনার জন্য খালসে (একনিষ্ঠ) হয় এবং এতে যনে অন্য কারো অংশ না থাকে। [ইবনে তাইমিয়ার কথা থেকে সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত; আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খণ্ড-৫]

আল্লাহই সঠিক পথের দিশারী।